বঙ্গমাতা

বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক-২০২১

পদকপ্রাপ্ত নারীদের জীবন বৃত্তান্ত

৮ আগস্ট ২০২১

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বঙ্গমাতা

বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক-২০২১ পদকপ্রাপ্ত নারীদের জীবন বৃত্তান্ত

সম্পাদনা পর্ষদ

ফরিদা পারভীন
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মোঃ ইয়ামিন খান
উপসচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মোহাম্মদ মাশহুদুল কবীর
উপসচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সূচিপত্র

বীর মুক্তিযোদ্ধা
অধ্যাপক মমতাজ বেগম
(মরণোত্তর)
বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক-২০২১
ক্ষেত্র: স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ — ৪

জয়া পতি
(মরণোত্তর)
বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক-২০২১
ক্ষেত্র: শিক্ষা — ৫

মোছাঃ নুরুন্নাহার বেগম
বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক-২০২১
ক্ষেত্র: কৃষি ও পল্লিউন্নয়ন — ৬

বীর মুক্তিযোদ্ধা
অধ্যক্ষ জোবেদা খাতুন পারুল
বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক-২০২১
ক্ষেত্র: রাজনীতি — ৭

নাদিরা জাহান
(সুরমা জাহিদ)
বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক-২০২১
ক্ষেত্র: গবেষণা — ৮

পটভূমি

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ১৯৩০ সালের ৮ আগস্ট গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে পৈত্রিক নিবাসে জন্মগ্রহণ করেন। বাঙ্গালি জাতির অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ফজিলাতুন নেছা মুজিব ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য সহধর্মিনী এবং বিশ্বস্ত সহচর। স্বামীর সকল কৃতিত্বে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য তিনি বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে এক অনন্য মহিয়সী নারী।

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মহানায়ক বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালি জাতির মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনের ধারাবাহিক আন্দোলন ও সংগ্রামে নিরবে নিভৃতে এই মহিয়সী নারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সমর্থন ও সাহস যুগিয়েছেন। মানুষের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে জীবনের অনেকটা সময় কারারুদ্ধ অবস্থায় কাটাতে হয়েছে। সেই কঠিন দিন গুলোতে বঙ্গমাতা অবিচল থেকে দৃঢ়তার সাথে সন্তান ও সংসার সামলিয়েছেন, একই সাথে কারাবন্দী বঙ্গবন্ধুর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন, নেতা-কর্মীদের সাহায্য ও সহযোগিতা এবং বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর সর্বময় সমর্থন বঙ্গবন্ধুকে দেশের কাজে আত্মনিবেদনের সুযোগ করে দিয়েছে। আজন্ম নিভৃতচারিনী এ মহিয়সী নারী বঙ্গবন্ধুকে দিয়েছেন দেশের জন্য কাজ করার নিরবিচ্ছিন্ন অবকাশ, যা পরবর্তীতে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয় এবং বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে বীর বাঙ্গালি ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল সূর্যকে। তাই বঙ্গবন্ধু যেখানে বাঙ্গালির স্বাধীনতার প্রাণপুরুষ, সেখানে প্রচার বিমুখ বঙ্গমাতা বাঙ্গালি জাতির স্বাধীকার আন্দোলনের একজন নেপথ্য কারিগর। তাঁর অপরিমেয় ত্যাগ ও সংগ্রামের জন্যেই একজন শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু থেকে বাঙ্গালি জাতির পিতা হতে পেরেছিলেন। বঙ্গমাতা বাঙ্গালির সহজ-সরল মাতৃপ্রতিকৃতি। তিনি একাধারে বিশ্বস্ত জায়া, স্নেহময়ী জননী আর স্বাধিকার আন্দোলনের নিভৃতে থেকে নেতৃত্বদানকারী গেরিলা যোদ্ধা।

এই মহিয়সী নারীর সংগ্রামী জীবন, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, ত্যাগ ও সাহসিকতা বাঙ্গালীসহ বিশ্বের সকল নারীর কাছে অনুপ্রেরণার উৎস। সরকার বঙ্গমাতার অবদানকে চিরস্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে রাজনীতি; অর্থনীতি; শিক্ষা; সমাজসেবা; স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ; গবেষণা; কৃষি ও পল্লিউন্নয়ন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন ক্ষেত্র এই ৮টি ক্ষেত্রে নারীদের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব' শীর্ষক রাষ্ট্রীয় পদক প্রবর্তন করেছে। নারীদের জন্য 'ক' শ্রেণীভূক্ত সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক হিসেবে প্রতিবছর ৫ জন নারীকে ৮ আগস্ট বঙ্গমাতার জন্মদিবসে ১৮ (আঠার) ক্যারেট মানের ৪০ (চলিশ) গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পদক, পদকের একটি রেপ্লিকা, ৪ (চার) লক্ষ টাকার ক্রসড চেক ও একটি সম্মাননা সনদ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা

অধ্যাপক মমতাজ বেগম

(মরণোত্তর)

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক-২০২১

ক্ষেত্রঃ স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ

বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক মমতাজ বেগম, এডভোকেট ১৯৪৬ সালের ১৩ এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা থানার শিমরাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আব্দুল গণি ভূঁইয়া এবং মাতার নাম জাহানারা খানম। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক পিতার অনুপ্রেরণায় তিনি ছাত্র জীবন থেকেই বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যাপক মমতাজ বেগম ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ সালের হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল আন্দোলন, ৬ দফা আন্দোলন, ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে মিটিং মিছিল, হলে হলে ছাত্র-ছাত্রীদের ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করা, পাড়ায় পাড়ায় মহিলাদের সংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মোটিভেশন, অস্ত্র চালনা ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রভৃতি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন ১৯৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পরিষদে সাত জন নারী প্রতিনিধির একজন। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল আগরতলা সার্কিট হাউজে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনের সময় মহিলা জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে শুধু মমতাজ বেগমই উপস্থিত ছিলেন। মমতাজ বেগম ১৯৭১ সালে বিএলএফ, যা মুজিব বাহিনী নামে পরিচিত-এর সদস্য হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি আগরতলায় বিএসএফ-এর হেডকোয়ার্টারে হাল্কা অস্ত্র ও যুদ্ধ পরিচালনা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি বিএলএফ এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আদান প্রদান করার দায়িত্ব পালন করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে গণ পরিষদের সদস্য হিসেবে মমতাজ বেগম বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র রচনায় সহযোগিতা ও স্বাক্ষর করেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সদিচ্ছা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ ও নির্যাতিত মহিলাদের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭২ সালে নারী পুনর্বাসনের জন্য গঠিত বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লীগ মহিলা ফ্রন্ট-এর সদস্য নির্বাচিত হন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্টের শোকাবহ ঘটনার পর তিনি ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৯৬ সালে মহিলা মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে নারীদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ গঠনে মমতাজ বেগম সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। রাজনীতির পাশাপাশি কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন কলেজে অধ্যপনা করেছেন। তিনি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারী উন্নয়নসহ অসহায় নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০১৪ সালে 'বেগম রোকেয়া পদকে' ভূষিত হন। বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক মমতাজ বেগম জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান হিসেবে ২০০৯ সাল থেকে আমৃত্যু সর্বস্তরের মহিলাদের সার্বিক উন্নয়ন ও অবস্থার পরিবর্তনে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। বাংলাদেশে নারী আন্দোলন ও নারীর ক্ষমতায়নে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। ২০২০ সালের ১৭ মে এই সংগ্রামী মহিয়সী নারী মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ও অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক মমতাজ বেগমকে 'স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ' ক্ষেত্রে মরণোত্তর 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২১' এ ভূষিত করা হয়।

জয়া পতি
(মরণোত্তর)

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক-২০২১
ক্ষেত্রঃ শিক্ষা

জয়া পতি ১৯৩২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শহীদ দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা এবং মাতা কিরণ বালা সাহা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জয়া পতিকে তাঁর ডাক নাম 'ছানা' বলে ডাকতেন। জয়া পতি একজন অত্যন্ত সফল মেধাবী শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক, পরিচালক, উদ্যোক্তা হিসাবে কুমুদিনী ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা (আরপিসাহা) মহোদয়ের সার্থক সুযোগ্য উত্তরসুরী। জয়া পতি ১৯৫০ এর দশকে যুক্তরাজ্য হতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালের ৭ মে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর পিতা দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা ও ভাই ভবানী প্রসাদ সাহা পাকিস্তানী বাহিনী ও রাজাকার দ্বারা অপহৃত হন। পরবর্তীতে তাঁদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। রণদা প্রসাদ সাহার অনুপস্থিতিতে তাঁর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, কুমুদিনী হাসপাতাল, ভারতেশ্বরী হোমস্, টাঙ্গাইল কুমুদিনী মহিলা কলেজের ছাত্রী ও অন্যান্য কর্মীর জীবন সংকটাপন্ন ও অভিভাবকহীন হয়ে পরলে জয়া পতি দক্ষতার সাথে এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বিশেষ করে ভারতেশ্বরী হোমস ও টাঙ্গাইল কুমুদিনী মহিলা কলেজের মাধ্যমে নারী শিক্ষা বিস্তার ও উন্নয়নে সক্রিয় অবদান রাখেন ও অনন্য নজির স্থাপন করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তাঁর ব্যবস্থাপনায় যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদানে কুমুদিনী হাসপাতাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তিনি ১৯৭৩ সালে কুমুদিনী হাসাপাতালে স্কুল অব নার্সিং প্রতিষ্ঠা করেন যা সারাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও উন্নতমানের শিক্ষার জন্য সুপরিচিত। সেখানে সম্পূর্ণ বিনা খরচে নার্সিং প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

নারায়নগঞ্জে প্রচলিত শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া ছেলে-মেয়েদের আত্মকর্মসংস্থানে সক্ষম করে গড়ে তুলতে তিনি ১৯৮৪ সনে প্রতিষ্ঠা করেন কুমুদিনী ট্রেড ট্রেনিং স্কুল। এ প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ বিনা খরচে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

২০০০ সালে স্বাস্থ্যগত কারনে তিনি ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ থেকে অবসর গ্রহন করেন। আজীবন শিক্ষানুরাগী জয়া পতি ২০১৬ সালের ৯ ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে শিক্ষার মানোন্নয়নে মহিলা উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। শিক্ষা প্রসারে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ জয়া পতি'কে 'শিক্ষা' ক্ষেত্রে মরণোত্তর 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২১' এ ভূষিত করা হয়।

মোছাঃ নুরুন্নাহার বেগম

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক-২০২১
ক্ষেত্রঃ কৃষি ও পল্লিউন্নয়ন

মোছাঃ নুরুন্নাহার বেগম ১৯৭৭ সালের ২৪ জুলাই পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলার অন্তর্গত পিপুলি পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল গফুর মোল্লা ও মাতার নাম মোছাঃ আনোয়ারা বেগম।

সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্ম নেয়ার কারণে মাত্র ১৪ বছর বয়সেই তার বিয়ে হয়ে যায়। অতি অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার পরেও তিনি সর্ব সময় চিন্তা করতেন কিভাবে আয় বৃদ্ধি করে পরিবারের স্বচ্ছলতা আনা যায় এবং কিভাবে সমাজের অন্যান্য নারীদের সেবা করা যায়।

তারই ফলশ্রুতিতে তিনি নিজের বাড়িতে ২/১ টি করে ছাগল, ভেড়া, হাঁস মুরগি পালন এবং বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজি চাষ করতে থাকেন। ২০০২ সালের দিকে একটি এনজিও প্রতিষ্ঠান হতে ২ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে বাড়ির পাশেই চাচা শ্বশুরের জমিতে সবজি চাষ ও বাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন শুরু করেন। পরের বছর একটি বেসরকারি ব্যাংক থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে ২টি গাভী ক্রয় করেন এবং বাড়ি সংলগ্ন ৫ বিঘা জমি লিজ নিয়ে বিভিন্ন শাক-সব্জির আবাদ শুরু করেন। এতে তিনি আশাতীত সাফল্য অর্জন করেন এবং নুরুন্নাহার কৃষি ফার্মের প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তিনি ব্যাংক থেকে পুনরায় আরো ৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে খামারে বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী জাতের ফলের সমারোহ ঘটানোর পাশাপাশি কুল ও পেয়ারার আবাদ বৃদ্ধি করেন এবং আরও ৫টি গাভী ক্রয় করেন। তার এই উত্তরোত্তর সাফল্যের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কৃষক-কৃষানিরা খামার পরিদর্শনে এসে হাতে কলমে শিক্ষা নিতে শুরু করে। পরবর্তীতে, ২০১০ সালে একটি সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক থেকে ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। প্রাপ্ত ঋণের টাকা দিয়ে ডেইরি খামারের গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২৭ টিতে উন্নীত করেন, পাশাপাশি ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগির সংখ্যাও বেড়ে যায় এবং কৃষি খামারের আয়তন বেড়ে হয় ৬০ বিঘা। প্রতিষ্ঠা লাভ করে নুরুন্নাহার ডেইরি খামার। চলতে থাকে ফল, শাক-সবজি উৎপাদনের পাশাপাশি প্রতিদিন ১২০০ লিটার করে দুদ্ধ উৎপাদন এবং বাড়তে থাকে কৃষি খামারের আয়তন ও ডেইরি খামারের পরিসর। ২০১৫ সালে এসে ডেইরি খামারের গাভীর সংখ্যা বেড়ে হয় ১৯০টি, ছাগল ৮০টি, ভেড়া ৫০টি এবং কৃষি খামারে আয়তন বেড়ে হয় ১০০ বিঘা। এছাড়াও বর্তমানে ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় দুগ্ধ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ; ঘি, মাখন ও পনির উৎপাদন; জ্যাম, জেলি ও আচার উৎপাদন এবং ফল-মূল ও শাক-সবজি সংরক্ষণের জন্য একটি আধুনিক মানের কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের প্রোজেক্টের কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে।

বর্তমানে নুরুন্নাহার কৃষি খামারের আয়তন ১৮০ বিঘা। মোছাঃ নুরুন্নাহার বেগম তার এই অর্জিত আশাতীত সাফল্যকে শুধুমাত্র নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। সমাজের দুস্থ ও অসহায় নারীদের সেবা করার মানসে প্রতিষ্ঠা করেছেন জয় বাংলা নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি সমাজের অসহায় দুঃস্থ নারীদের একত্রিত করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। শুধু তাই নয় একজন সমাজকর্মী হিসাবে সারা দেশের প্রায় ১৩০০ নারীকে নিজে জামিনদার হয়ে ব্যাংক ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। প্রাপ্ত ঋণ দ্বারা তারা প্রত্যেকেই নিজের বাড়িতে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করেছেন।

বর্তমানে কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহায়তায় বাসভবনের পাশে নিজের জমিতে একটি ট্রেনিং সেন্টার ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র তৈরীর উদ্যোগ গ্রহন করেছেন এবং ভবন নির্মাণের কাজ চলছে।

মোছাঃ নুরুন্নাহার বেগম অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিজ কর্মগুণে নিজেকে বর্তমানে বাংলাদেশের একজন সফল নারী কৃষি উদ্যোক্তা ও সফল সমাজকর্মী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মোছাঃ নুরুন্নাহার বেগম-এর এই ধারাবাহিক কার্যক্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ 'কৃষি ও পল্লিউন্নয়ন' ক্ষেত্রে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২১' এ ভূষিত করা হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা

অধ্যক্ষ জোবেদা খাতুন পারুল

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক-২০২১

ক্ষেত্র: রাজনীতি

বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ জোবেদা খাতুন পারুল ১৯৫০ সালের ৩০ ডিসেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সোনা মিয়া, মাতার নাম এন্তেজেরন্নেছা।

অধ্যক্ষ জোবেদা খাতুন ছাত্র জীবন থেকেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী হিসাবে তার রাজনৈতিক জীবনের শুরু করেন। তিনি ১৯৬৬ সনে কুমিল্লা সরকারী মহিলা কলেজে ছাত্রলীগ মনোনীত ছাত্রী সংসদে নির্বাচিত সাহিত্য বিতর্ক সম্পাদিকা ছিলেন। ছয় দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজপথে আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৮ সনে রোকেয়া হল ছাত্রলীগ শাখা সাংগঠনিক সম্পাদিকা নির্বাচিত হন।

১৯৬৮ সন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থাকাকালীন সময়ে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর সান্নিধ্যে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং তাঁর কাছ থেকে রাজনৈতিক দিক্ষা এবং পরামর্শ অনুযায়ী তার কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক কারনে পারিবারিক ভাবেও তাঁর সাথে বিভিন্ন সময়ে উপদেশ পাওয়ার সৌভাগ্য হয়।

১৯৭১ সনে ২৫ শে মার্চ রোকেয়া হল ত্যাগ করে সুদূর গ্রামে গিয়েও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ক্যাম্প পরিচালনা, মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা, শরণার্থীদের নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করা সর্বোপরি মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সংরক্ষণ করা ও হেফাজতে রাখার ব্যবস্থা করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে মাঝে গোপন সংবাদ ও তথ্যাদি প্রদান করেন, যার ভিত্তিতে মুক্তিযোদ্ধারা অপারেশন সফল করতে সক্ষম হতেন।

তিনি ১৯৭৮ সন থেকে কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগ রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। তখন থেকেই কুমিল্লা জেলা মহিলা আওয়ামী লীগ গঠন করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। দীর্ঘপথ পরিক্রমায় ২০০০ সালে কুমিল্লার মহিলাদের সংগঠিত করে মহিলা আওয়ামী লীগ গঠন করা হয়। তিনি ২০০০ সাল থেকে অদ্যবধি কুমিলা দক্ষিণ জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

২০১৭ সালে কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা মহিলা আওয়ামী লীগ এর মাধ্যমে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নির্বাচনী ইস্তেহার, এসডিজি বাস্তবায়নে ও দলীয় অঙ্গীকার ও সরকারের নারী অধিকার ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের যে সূচকগুলো নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও নিজ নিজ এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দলের আদর্শ লক্ষ্য ও চেতনা নিয়ে কাজ করতে উৎসাহ জুগিয়েছেন।

সামাজিক কর্মকান্ড ও সামাজিক পুঁজি গঠনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে ও কুমিল্লায় অসংখ্য নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে নারীদের অধিকার বাস্তবায়নে কাজ করেছেন।

কুমিল্লায় দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০০ সনে গণ বিদ্যাপীঠ কারিগরী ও বাণিজ্যিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি উক্ত কলেজে ১০ বছর দক্ষতার সাথে অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ জোবেদা খাতুন পারুল-কে 'রাজনীতি' ক্ষেত্রে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২১' এ ভূষিত করা হয়।

নাদিরা জাহান (সুরমা জাহিদ)

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক-২০২১
ক্ষেত্রঃ গবেষণা

নাদিরা জাহান ১৯৭৮ সালের ৯ জুলাই নেত্রকোনা জেলার নাগরা গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম আলফাজ উদ্দিন আহমেদ, মাতার নাম আম্বিয়া আক্তার। ছোটবেলায় বাবার মুখে মহান মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনতে গিয়ে 'বীরাঙ্গনা' শব্দটি শুনতে পেয়ে এর কোন সদুত্তর না পাওয়ায় এর প্রতি তাঁর আগ্রহ ধীর ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক সময় ঘটনাচক্রে এক মহিলার হৃদয় বিদারক মর্মস্পর্শী করুণ কাহিনী শুনতে পেয়ে জানতে পারেন, তিনি বীরাঙ্গনাদের বিষয়ে আরও আগ্রহী হয়ে উঠেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৮ সালে কোন রকম আর্থিক সহযোগিতা ব্যতিরেকেই তিনি বীরাঙ্গনাদের সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সারা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, বিশিষ্ট জন, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতায় এযাবৎ প্রায় ৬০০ জন বীরাঙ্গনা-বীরমাতা-নারী মুক্তিযোদ্ধার নারকীয় পৈশাচিক করুণ কাহিনীর তথ্যাদি সংগ্রহ করেন- যা বর্তমানেও চলমান রয়েছে।

শুরুতে ১৯৯৭-১৯৯৮ সালের দিকে বীরাঙ্গনাদের তথ্যাদি সংগ্রহ করা খুবই দুরুহ ও কঠিন কাজ ছিল। বহু ধরণের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে এ কাজটি করতে হয়েছে। সেই সব বীর মাতাগণ কথা বলতে-মুখ খুলতে চাইতেন না, তাঁদেরকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়, হচ্ছে এবং আরো হতে পারে-এই ভেবে। স্থানীয় লোকজনের অনেকেই তাঁদের সম্পর্কে অশালীন, আপত্তিকর, আজেবাজে ও বিশ্রী মন্তব্য করেছে, যা তাঁরা নীরবে সহ্য করেছেন। এমনকি স্থানীয়ভাবে তাঁদেরকে কোন কাজ করার সুযোগও দেয়া হয়নি, সমাজে তাঁদেরকে স্থান দেয়া হয়নি, অনেক সময় তাঁদেরকে সামাজিকভাবে একঘরে করে রাখা হয়েছে। বহু কৌশল অবলম্বন করে তাদের তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে, একজন বীরাঙ্গনা-বীরমাতার সন্ধান পেয়ে তাঁর তথ্যাদি সংগ্রহ করতে ৬ মাস এমনকি এক বছরও লেগেছে। এমনও হয়েছে যে, একজনের তথ্য সংগ্রহ করতে ঐ এলাকায় ৪/৫ দিন পর্যন্ত অবস্থান করতে হয়েছে, লোকালয় ছেড়ে দূরে নির্জন জায়গায়-হাওড়, পাহাড়, জঙ্গলে,এমনকি রাতের অন্ধকারেও কুপি বাতি জ্বালিয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয়েছে। ঐসময় এমনও অনেকে ছিলেন যারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সমাজ এই সমস্ত বীরাঙ্গনা-বীরমাতাদের নিগৃহীতভাবে দেখায়, তাঁরা নিজেদেরকে প্রকাশ করেননি।

প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ কাজ করতে গিয়ে অনেক স্থানেই স্থানীয়দের অনেক বাঁধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে, ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে তাদের তথ্য রেকর্ড করে পরে দোভাষীর সহায়তায় অনুবাদ করা হয়েছে।

২০১০ সালে ৫০ জন বীরাঙ্গনা-বীরমাতার সংগৃহীত তথ্য দিয়ে 'বীরাঙ্গনাদের কথা' নামক তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রথম গবেষণা কর্ম প্রকাশের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন গণমাধ্যমসহ সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে বিষয়টি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে এবং এখনও চলছে। বিভিন্ন গণামাধ্যমে প্রায়শঃই ফিচারসহ উপসম্পাদকীয়তে এ বিষয়ে তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা আসলেই অবিচ্ছেদ্য ভাবেই আমাদের হৃদয়ে দাগ কাটে বাংলার মা-বোনদের উপর মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসের অমানবিক অত্যাচরের কথা। মহান মুক্তিযুদ্ধে সম্ভ্রম হারানো সেই সব বীরাঙ্গনাদের বিষয়ে ধারাবাহিক গবেষণা কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ নাদিরা জাহান (সুরমা জাহিদ)'কে 'গবেষণা' ক্ষেত্রে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২১' এ ভূষিত করা হয়।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
www.mowca.gov.bd